মূলপাতা

দাম্পত্য

Nusrat Rahman

2020-05-13 20:53:35 +0600 +0600

51 MIN READ

[১]

আমার বিয়ের পর থেকে বিবাহ নামক সম্পর্কের বাঁধনটা নিয়ে অনেক ভেবেছি। ধুম ধাম করে বড় করে মেহেদী, বিয়ে, রিসেপশন এর পরে কী হয়? জমকালো সাজে বউটা বেশ আনন্দের সাথে নতুন ঘরে পা রাখে। তারপর কী হয়? আনুষ্ঠানিকতার লৌকিকতা যত ফিকে হয়ে আসে, মেহেদীর নকশা যত মিলিয়ে যেতে থাকে, বউটাও কি তত মেয়ের মত হয়ে মিশে যায় এই পরিবারে? অচেনা বা অর্ধচেনা মানুষটি কি তার বাকি সব বন্ধনের অভার ভুলিয়ে দিতে পারে?

বিয়ের আগে আমার একমাত্র বিবাহিত বান্ধবীর কাছে জানতে চেয়েছিলাম, বিয়েটা আসলে কী বল্ ত? তুই তোর বরকে কি মাথায় করে রাখিস? কোন কিছু পছন্দ না হলে কী করিস? বাবা মায়ের কথা যেমন আমরা পছন্দ না হলেও মেনে নেই, এখানেও কি তুই তাই করিস? নাকি বন্ধুর মত মতে না মেলা পর্যন্ত গলা ফাটিয়ে তর্ককরিস? ওর কোন একটা কাজ অন্যায় দেখলে তুই কীভাবে সামলাস? ইত্যাদি ইত্যাদি। আচ্ছা পাঠক, বলুন ত, আপনাদের মধ্যে কি একজনও আছে যে বিয়ের আগে এসব ব্যাপারে স্পষ্ট ধারণা নিয়ে আসে? একজনও কি আছে যে বলতে পারে, না, আমার মা আমাকে এগুলো শিখিয়ে দিয়েছেন? ছেলেদের অবস্থা ত আরো ভয়াবহ। ছেলেকে স্বামী হওয়ার জন্য প্রস্তুত করার দায়িত্ব বাবার, এইটাত বাবারা কল্পনাই করতে পারেন না। মাঝে মধ্যে মনে হয়, এ যুগের বাবারা কি জীবিকা ছাড়াও জীবনে শেখার কিছু আছে এটা জানেন?

বেশির ভাগ ছেলেমেয়েরই যেটা হয়, একগাদা অবাস্তব স্বপ্ন নিয়ে তারা সংসার শুরু করে। মেয়েটা মনে করে দিন রাত চব্বিশ ঘন্টা ছেলেটার চিন্তা জুড়ে থাকবে শুধু সে। তার চাওয়া পাওয়ার দিকে শতভাগ মনোযোগ থাকবে। অপর দিকে ছেলেটা দেখে কল্পনার পরী জোছ্না রাতে গল্প করতে আসলেই বেশ লাগে। সিন্দাবাদের ভুতের মত ঘাড়ে চেপে থাকলে অসহ্য বোধ হয়। ফলাফল, মেয়েটার অভিযোগ, আর ছেলেটার উদাসীনতা। স্বপ্নের নীড় স্বপ্নের দেশেই পড়ে থাকে। এর সাথে যদি অভিভাবকদের অন্যায় ব্যবহার যোগ হয়, তখন এই স্বপ্নকাতর কপোত কপোতীর কী যে দশা হয় বলাই বাহুল্য। একটা সময় হয়ত মেয়েটার মন কঠোর হয়ে যায়, ছেলেটা নিজের মত করে ভাল থাকতে শিখে যায়, দুজনেই কষ্টগুলোকে একা একা সামাল দিতে শিখে যায়। দূর দেশে কেঁদে মরে অপূর্ণ স্বপ্নগুলো। তার কান্না ভুলতেই বোধ করি এত এত বাস্তবতায় নিজেকে বেঁধে ফেলতে হয়।

যাই হোক। আমি কখনও চাইনি আমার বা আমার বন্ধুদের দাম্পত্য জীবন এমন হবে। তাই শুধু খুঁজতাম একটা তালিসমান, একটা ম্যাজিক স্পেল—যেটা ফলো করলে স-ব সমস্যা নিমিশেই ফিনিশ হয়ে যাবে।

স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কনিয়ে একটা মনে গেঁথে থাকার মত মন্তব্য শুনেছিলাম ড: মুহম্মদ জাফর ইকবালের মুখে, একটা অনুষ্ঠানে মনে আছে বলেছিলেন যে, এই সম্পর্কটা একটা পুরনো জামার মত। আমার এই তুলনাটা এত ভাল লেগেছিল! শুনেই মনে হয় কমফোর্ট আর কমফোর্ট। আমার বান্ধবীও বলল, প্রবলেম হলে মনে জমায় রাখবি না। কথা বলে সলভ করবি। বলে ফেললে দেখবি শান্তি।

আমি প্রথম প্রথম তাই করতাম। কিন্তু ফলাফল দেখে বুঝলাম এ পদ্ধতি সবসময় সবার জন্য না। কখনো কখনো একটু নিরবতা অনেক কথা বলে। দুজনের মতে না মিললে আমার মনে হাজার যুক্তি দাঁড়িয়ে যেত, তা বলার জন্যে আর ঠিকটাকে প্রতিষ্ঠা করার জন্যে যেন আর তর সইত না। অঙ্ক কষে দুইয়ে দুইয়ে চার না মিললে হতবুদ্ধি হয়ে যেতাম। আমি ত ঠিক ই বলেছি। ঠিক বললেই ঠিক হয় না কেন? আবার দেখলাম আমি ভুল করলে প্রাণপনে মনটা চায় একটু যেন রেহাই দেয় ও, কিছু যেন না বলে।

বুঝলাম, আমার ন্যায়ের ঝান্ডার চেয়ে ওর নীরব সহিষ্ণুতা অনেক বেশি শক্তিশালী।

কিন্তু চুপচাপ থাকার পক্ষে কোন রেফারেন্স পাচ্ছি না ত! আর এটা কেমন কথা? দোষ দেখলে খালি চুপ করে থাকলে হবে? কত সময় কাজে ঝামেলা লেগে যায়, কথা পছন্দ হয়না, তখন শুধু চুপ থেকে চোখের পানি ফেলব নাকি? আর এভাবে আদৌ ত কোনদিন কেউ কাউকে উপরে তুলতে পারবনা, উল্টা মনে অনেক অভিমান জমা হবে। কী করি? উত্তরটা একদিন পেয়ে গেলাম কুরআনের পাতা উল্টাতে উল্টাতে। তাফসিরে একটা কোণে ছোট্ট করে লেখা—spouses are to establish peace and harmony.

এই হারমনি নিয়ে চিন্তা করতে থাকলাম, করতেই থাকলাম। হারমনি মানে কী? হারমনি মানে এক সুরে গাঁথা, ছন্দ মিলিয়ে চলা। একসাথে মিলে সুন্দর একটা গান রচনা করা। একসাথে, একই ছন্দে তালে তাল মিলিয়ে একটা কিছু তৈরি করা—এমনভাবে যেন কোথাও কর্কশ সুর না বাজে। আমার এই বিজ্ঞ জজ সাহেবের ভূমিকা কি হারমনি তৈরি করছে? মোটেও না। তার মানে কি যেভাবে চলে চলুক বলে তালে তাল মিলিয়েই যাব? অবশ্যই না।

দুটো ভিন্ন স্কেলের কম্পোজিশনকে এক জায়গায় আনতে হলে কখনও তর্ক, কখনও ধৈর্য, কখনও একটু অভিমান—অনেক কিছুই ব্যবহার করতে হয়। যা বুঝেছি, সায়েন্সের জটিল বিষয়াদি বুঝতে যেটুকুবিদ্যা খরচ হয়, হিউম্যান সাইকোলজি বুঝতে তার চেয়ে অনেক বেশিই কসরত করতে হয়। কিন্তু সবশেষে যে তানটা বাঁধা হবে তার চমৎকারিত্বে আশ্চর্য হয়ে যেতে হবে। এ যেন একটা ঝড়ো হাওয়ার মত, শক্তিকে শক্তি দিয়ে বাধা দিয়ে প্রলয় আরো বাড়াতেও পারেন, বাঁশির মধ্য দিয়ে বইয়ে অপূর্ব সুর ও তুলতে পারেন।

[২]

দাম্পত্য জীবনে হারমনি প্রতিষ্ঠা করা এমন না যে একটা তুড়ি বাজালাম আর হয়ে গেল। ইনফ্যাক্ট প্রতিদিনের কাজকর্মের মুখ্য উদ্দেশ্যই আমাদের হওয়া উচিৎ হারমনি আনা, যতক্ষণ এক সুরে সুর বাজে, মনে হয় এর বেশি আর কী চাওয়ার আছে জীবনে? কিন্তু মানুষ ত অনেক ভাবেই দুজনে মিলে সুখে থাকতে পারে, তাই না? স্বার্থপরের মত, ভোগবিলাসীর মত, অন্যায়কারীর মত—এদের হারমনিও ত হারমনি। কিন্তু তাতে স্বর্গীয় সুখ কই? ফেরেশতাদের ডানা বিছানো 'সুকুন' কই? আল্লাহ যে বলেছেন অমন পরিবারে তিনি রহমত নাযিল করেন, ফেরেশতারা সে পরিবারের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করতে থাকেন?

আস্তে আস্তে মনে হল, দাম্পত্য নিয়ে মানুষ তিন স্তরে সন্তুষ্ট থাকতে পারে। এক, একজন আরেকজনের কমফোর্ট হবে। তা শুধু খাবার দাবার, আর অন্যান্য শারীরিক কমফোর্টই না, দু'জনের নিজস্ব জগতের অশান্তি শেয়ার করে হালকা হবে, বাইরে অনেক অপমান সহ্য করে ঘরে এসে নিশ্চিন্তে মাথা গুঁজতে পারবে। এমন নিরাপত্তা আর প্রশান্তি পেলে একটা সংসারে আসলে আর কিছু লাগেনা। রাসুলুল্লাহ (স) তাঁর পনের বছরের বড় (এ নিয়ে দ্বিমত চলছে আজকাল) স্ত্রীর কাছে এতটাই নিরাপত্তা, সম্মান আর ভালবাসা পেয়েছিলেন, খাদিজা (রা) মারা যাওয়ার অনেক বছর পরেও তাঁর কথা ভেবে রাসুলুল্লাহ (স) এর চোখে পানি চলে আসত। আসবেই ত। জিবরাইল (আ) কে প্রথমবার দেখে উনি ভয়ে এত উপর থেকে নেমে ঘরের মধ্যে এসে চাদর দিয়ে মুড়িয়ে টুড়িয়ে স্ত্রীকে বলেছিলেন 'আমাকে কি জ্বীনে ধরেছে?' উনার স্ত্রী কোত্থেকে জানবে উনার কী হয়েছে? উনি কি ফেরেশতা মারফত আগে খবর পেয়েছিলেন? উনি যা জানতেন তা হল, মুহম্মদ (স) কত অসাধারণ মানুষ। এরকম একটা ঘটনার প্রেক্ষিতে উনি রেফারেন্স টানলেন রাসুলুল্লাহ (স) এতিমদের কত যত্ন করেন, কত সত্যবাদী ইত্যাদি ইত্যাদি। এসব কথা এখানে বলা কি খুব প্রাসঙ্গিক ছিল? খাদিজা (রা) যা করেছেন তা হল উনি রাসুলুল্লাহ (স) এর নিজের সম্পর্কেভয়, শঙ্কা দূর করে দিয়েছেন তাঁর সম্পর্কেঅনেক পজিটিভ কথা বলে। আমরা আমাদের পার্টনারের ভঙ্গুর সময়ে কতটুকুভাল কথা বলি? আর আউট অব কনটেক্সট প্রশংসা? অসম্ভব! আউট অব কনটেক্সট অভিযোগ করা যায়, কিন্তু প্রশংসা? কদ্যপি নহে!

আমার বাসায় হিটার ঠিক করতে এক ইলেক্ট্রিশিয়ান এসেছিল, ভদ্রলোক খুব কথা বলতে পছন্দ করেন, কথায় কথায় বলেছিলেন, তোমাদের মেয়েদের আমি হিংসা করি। you don't know the power of your words. শুধু মুখের কথা দিয়ে you can bring a lion out of a mouse.

খাদিজা (রা) এর মত প্রজ্ঞা যদি সব ছেলেমেয়ের থাকত, শুধু কথা দিয়েই কত শান্তি তৈরি করতে পারত ঘরে। একইভাবে মন খারাপ হলে তার টেক কেয়ার করা, বাইরে অপমান জনক একটা কিছু ঘটলে ঘরের মানুষটা আরো অনেক বেশি kindness দিয়ে তার মনের জোর ফিরিয়ে আনা—এ বিষয়গুলোতে অনেক বেশি যত্নশীল হওয়ার দরকার আছে। ছেলেরা বোঝে না মেয়েদের কমফোর্ট কেবল ভাল শপিং করতে পারার স্বাধীনতার মধ্যেই না। এপ্রিসিয়েশন একটা ছেলের জন্য যতটা ইন্সপায়ারিং, একটা মেয়ের জন্য তার চেয়েও বেশি। অনেক সময়ই মেয়েটার চিন্তাভাবনা বা বাইরের কাজে ম্যাচিউরিটি ছেলেটার মত হয়না, তখনও বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ নেয়া মেয়েটার মানসিক শক্তি বাড়াতে অনেক সাহায্য করে। ঘরের কাজে ব্যস্ত থাকায় মেয়েটার বাইরে এক্সপ্লোর করার সুযোগ সমানভাবে হয়না। এর প্রভাব যদি তার চিন্তায়, আচরণে পড়ে, আর তার কারণে স্বামীর থেকে তিরস্কৃত হতে হয়, তাহলে মেয়েটার কী দায় পড়েছে সংসারের ঘানি টানতে? সেও ত স্মার্ট হওয়ার, আধুনিক হওয়ার জন্য সময় ব্যয় করতে পারে, ঘরে সময় না দিয়ে। এই সব খুঁটিনাটি অনেক কিছুই দুই পক্ষে মনের মধ্যে জমা হয়। তার কিছু কথা বলে, কিছু ক্ষমা করে, আর পুরোটা আল্লাহর থেকে রিটার্ণ পাওয়ার আশায় মন থেকে মুছে ফেলে কমফোর্ট বাড়ানোর চেষ্টা করতে হবে।

ও! কমফোর্ট এর কথা এতবার বলেছি, একটা কথা বলিনি, পুরোনো জামার awesome উদাহরণটা খুব সংক্ষেপে কুরআনে আছে। husband and wife are garments for each other. তাও রোজার নিয়মের দুইটা আয়াতের মাঝখানে দেয়া। নোমান আলি খান এর ব্যাখ্যা করেছেন খুব সুন্দর করে, রোজায় ইফতার, সেহরি, তারাবী, কুরআন পড়া—এসব রুটিনের মধ্যে স্বামী স্ত্রী একে অপরকে যেন কভার করে যাতে দুজনই সমানভাবে স্পিরিচুয়ালি এগোতে পারে।

[৩]

কমফোর্ট আর স্বস্তি একটা ঘরে সুখের ফোয়ারা বইয়ে দিতে পারে সত্যি, কিন্তু এর বাইরেও দাম্পত্য জীবনে অনেক কিছুই করার আছে। স্বামী স্ত্রী উত্তম বন্ধু রূপে শুধু একে অপরকে নিরাপত্তাই দিয়ে যাবে জীবনভর, এর বাইরে আর কিছু নয়—ব্যাপারটা এমন নয়। আর চাহিদা অনুযায়ী পরিপূর্ণ আরাম না পেলেই যে সংসার উচ্ছন্নে যাবে—তাও না। পুরোপুরি স্বতন্ত্র দু'জন মানুষের আচরণ সব সময়ই পছন্দ মত হবে—এমন ভাবাটা ঠিক না। পদে পদে কমফোর্ট নষ্ট হবে, কমিউনিকেশন এর সব চেষ্টা ব্যর্থ হবে, ক্ষুদ্রতা দেখে বুক ভেঙে যাবে—সম্মানের বদলে জায়গা করে নেবে করুণা—এমন অনেক কিছুই হতে পারে। তখন কি আল্লাহর প্রতিশ্রুত শান্তি সে ঘর থেকে হারিয়ে যাবে? বিয়ের উপর যে এত বার করে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, রাসুলুল্লাহ (স) যে বলেছেন, দ্বীন এর অর্ধেক হচ্ছে বিবাহ—তা কি দুটো ব্যক্তিত্বের অসামঞ্জস্যেই ভুল হয়ে যাবে? তা কী করে হয়?

আমার কাছে মনে হয় দাম্পত্যের দ্বিতীয় স্তরের পূর্ণতা আসে যখন স্বামী স্ত্রী সত্যি সত্যি একে অপরকে পূর্ণতা দেয়ার জন্য চেষ্টা করে। যখন একজন অপরজনের দোষত্রুটি গুলি চিহ্নিত করে সেগুলি বদলানোর জন্য কাজ করে। আমি ফাইন্যান্সিয়াল ব্যাপার কিচ্ছু বুঝি না, আমার স্বামী ধৈর্যের সাথে অল্প অল্প করে একটু করে কাজ দিয়ে আমাকে মানুষ করার চেষ্টা করছে। অপরদিকে তার লেখা নিয়ে একটা ভীষণ রিপালশন কাজ করে। আমি চেষ্টা করছি প্রতি সপ্তাহে ছলে বলে কৌশলে যে করেই হোক একটা করে তার কাছ থেকে লেখা আদায় করতে। ও লেখায় সরগর না হলে কি আমার ঘর ভেঙে যাবে? আমার কী দায় পড়েছে ওকে দিয়ে লেখাতে? কিন্তু আমরা ত আগামী অনেকগুলো বছর ইনশাআল্লাহ একসাথে থাকব, আল্লাহ ছয়শ কোটি মানুষের মধ্যে থেকে আমাদের দুজনকেই এক সাথে জীবন কাটানোর সুযোগ দিয়েছেন। এর মধ্যে কি আল্লাহর এতটুকু প্ল্যান ছিলনা, যে আমার উইকনেস ও দূর করবে, ওর টা আমি?

একই কথা স্পিরিচুয়ালিটির বেলায়ও। স্পিরিচুয়ালিটি আর স্বামী স্ত্রী নিয়ে ভাবতে গেলে আমার কেবল একটা উদাহরণই মনে আসে। লতানো গাছ দেখেছেন, ঐ যে ছোট ছোট আঁকশির মত বের হয়ে একটা কিছু ধরে বেয়ে ওঠে? এমন দুটো গাছ যেন পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে একজন আরেকজনের থেকে সাপোর্ট নিয়ে দ্রুত উপরের দিকে উঠে যাচ্ছে। এই গাছ দুটোর একটা শক্ত দৃঢ় ভিত্তির উপরে দাঁড়ানোও হতে পারে, আরেকটা তার উপর ভর দিয়ে উপরে উঠবে। অর্থাৎ স্বামী স্ত্রীর একজন বেশি প্র্যাক্টিসিং, অপরজন কমও হতে পারে, সেক্ষেত্রে সাপোর্ট দিয়ে দিয়ে টেনে তুলতে হবে। ভেবেই দেখুন না, কী একটা জুটল কপালে—এই ভেবে কপালকে দোষ না দিয়ে এভাবেও ত দেখা যায়—আল্লাহ আপনার স্ট্রেংথ জানেন, আল্লাহ পারফেক্ট কমপ্লিমেন্ট খুঁজে দিয়েছেন আপনার জন্য। এখনকার যে অশান্তি হচ্ছে, তা হচ্ছে এ কারণে যে আপনি আপনার করণীয় সবটুকু করছেন না। আপনার কথা ছিল অনেক বেশি নিজেকে উন্নত করার, আর উদাহরণের মাধ্যমে ধৈর্য ধরে অপরজনকে শেখানোর। আপনি তা না করে আরো ভাল কিছু পেতে পারতেন এই আফসোস এ মাথা কুটে মরছেন।

এমনকি ভাল, আরো ভাল—এই মাপকাঠিটাও ত মানুষের জন্য অসম্পূর্ণ। সে হয়ত বিচার করার সময় একটা স্বভাবের দোষ ধরে ভাগ্যকে ধিক্কার দিচ্ছে। অন্যদিক দিয়ে হয়ত তাদের মধ্যে এত সুন্দর সামঞ্জস্য—যেটা তার কাছে এতই ন্যাচারাল যে টেরও পাচ্ছেনা এর মূল্য কত। আগের লেখায় একটা পাথরের কথা বলেছিলাম না? আপনি হয়ত আপনার সম্পর্কের এবড়ো খেবড়ো অংশটাই শুধু দেখছেন, একটু সময় নিয়ে উল্টে দেখুন, তার অনেক ভালো দিকও চোখে পড়বে। রাসুলুল্লাহ (স) ত বলেছেন, স্ত্রীদের সাথে নরম আচরণ কর, কারণ তার এক আচরণ তোমার অসন্তুষ্টির কারণ হলেও, অন্য আচরণ তোমায় সন্তুষ্ট করবে। স্বামীদের জন্য এটা আরো বেশি সত্যি। কারণ আমরা স্ত্রীরা অভিযোগে মুখর হতে খুবই পারদর্শী।

আমি ঘরের কাজে অপটু, বাইরের কাজে অকর্মণ্য। ভাবনার জগতে ক্রীড়ণক, বাস্তব জীবনে জড়ভরত। আমার অতি প্র্যাক্টিকাল স্বামীর অভাবে আমি অর্ধেক না, এক চতুর্থাংশ হয়ে থাকতাম বোধহয়। কিন্তু আমার যেটুকুঅগুণ আছে তাই দিয়ে ঠেলেঠুলে এমন একটা জায়গা করে নিয়েছি যে জানি ওই জায়গার দখল পাকাপাকি ভাবে আমার হয়ে গেছে। গুণ যেখানে কম, অধ্যবসায়ের সেখানে পুরো ব্যবহার ত করতেই হবে, তাই না? তাই ওর অদক্ষতাগুলোতেই আমার যত জোর। আল্লাহকে ধন্যবাদ ও দেই, অন্তত একটা কিছু যোগ করার মত যোগ্যতা ত আমার আছে। যদি কমফোর্টই সুখের একমাত্র ইয়ে হত, তাহলে আমি ফেল করতাম নির্ঘাত।

এক রাতে প্রচণ্ড গরমে পুরো আড়াই ঘন্টা লোডশেডিং ছিল আমাদের এলাকায়। খুব দেশ দেশ লাগছিল সময়টাকে। আমরা অন্ধকার ঘরে মনের সুখে গপ্পো করেছি অনেকক্ষণ। লোডশেডিং হওয়াতে আমাদের মনে এতই ফুর্তি হয়েছিল, গল্পের ফাঁকে সে নিজে গান বানিয়ে সুর দিচ্ছিল। আমি তখন ওকে বললাম, Thanks to Allah, He joined a composer with a singer, a speaker with a writer, a philanthropist with a pure mind.

[৪]

আমার বিয়ের আগে একটা মাত্র উপদেশ পেয়েছিলাম আমার এক কাজিনের থেকে, সে বলেছিল, যত যাই হোক, তোদের একটা কমন পয়েন্ট অব ইন্টারেস্ট রাখবি। যাতে তোদের শখের জিনিসটা নিয়ে আলোচনা করতে পারিস, দেখবি অনেক ঝড়ের মধ্যেও ওটা তোদের কাছাকাছি রাখবে।

আমি এত ভাল বুঝি নাই। কমন পয়েন্ট অব ইন্টারেস্ট—আমাদের ত আনকমন ইন্টারেস্ট খুঁজে পাওয়াই কষ্ট বেশি। এক সাবজেক্টে পড়াশুনা করেছি, এখনও একই জায়গায় একসাথে পড়ি, কমন না কী? সবই ত কমন। যাই হোক, মূল্যবান উপদেশটার মাথা মুণ্ডু হদিস করতে না পেরে শিকেয় যত্ন করে তুলে রেখেছিলাম। ল্যাব এ জয়েন করার পর আমার সুপারভাইজর কাপলটাকে দেখে খুউব ভাল লাগত। ভদ্রলোক বেশ আলাভোলা সাইন্টিস্ট, ভদ্রমহিলা খুব কেয়ারিং, অর্গানাইজড। আমরা বাসায় এসে বলাবলি করতাম, আমরা ওদের মত কাপল হব, হ্যা? একই ওয়ার্কপ্লেসে কাজ করাটা অনেকটা ঘরের কাজ ভাগাভাগি করে করার মত। পারস্পরিক সমঝোতা তৈরি হওয়ার সুযোগ অনেক বেড়ে যায়। উল্টোটাও

হতে পারে, ব্যক্তিত্বের সংঘাত আরো বেড়েও যেতে পারে, কারণ ভুলগুলো আরো বেশি চোখে পড়বে।

কিন্তু ভলান্টারি কাজ একসাথে করার মধ্যে যে আনন্দ তার কোন তুলনা হয়না। এতে ত কোন কিছু পার্থিব লাভ বা ক্ষতি নেই, তাই ভুলচুক হলেও অত গায়ে লাগেনা। আবার কাজটা না করলেও ত সে পারত—এরকম একটা মেন্টালিটি থাকে, তাই ছোট্ট কাজকেও খুব মহৎ লাগে। অন্যের জন্য স্বার্থ ছেড়ে কাজ করার একটা বাই ডিফল্ট ভাল অনুভূতি আছে, সেটা প্রিয় মানুষটার সাথে ভাগাভাগি হলে আনন্দটা বহুগুণ বেড়ে যায়। হয়ত কোনদিন ভাল করে চোখ মেলে দেখেন নি, যে তার ভেতর এত মহত্ত্ব আছে। আর কিছু না, ছোট্ট একটা চ্যারিটিও দুজন মিলে প্ল্যান করে করলে হঠাৎ একটা উপলব্ধি আসে, 'কীসের জন্য তেল নুন চাল ডাল নিয়ে ঝগড়া করছি? আমরা একসাথে ত আছি অ-নে-ক উপরের লেভেলের কাজ করার জন্য।' আমার সত্যিই মনে হয় আল্লাহ এরকম ইফোর্ট দেখলে এত খুশি হন যে নিজ উদ্যোগে তখন ঘরটা শান্তি দিয়ে ভরে দেন। আর ভাল কাজ একসাথে মিলে করলে খুব গর্বও হয়, আমার বউ/ স্বামী আর দশজনের মত না, সে অন্যদের কথা ভাবে, সে স্বার্থপর না।

অনেক দম্পতির নানা কারণে ঘরের বাইরে ভলান্টারি কাজ করার সুযোগ নেই। আসলে বাইরে যাওয়ার দরকারও নেই। সন্তান মানুষ করার কাজটাকে যদি কেউ জাস্ট আল্লাহকে খুশি করার উদ্দেশ্যে পূর্ণ ইফোর্ট দিয়ে করে, তাহলে এর চেয়ে বড় চ্যারিটি আর হয়না। কিন্তু এই প্যারেন্টিং ইস্যু তে এসে দম্পতিরা সবচেয়ে বেশি ধরা খেয়ে যান। তারা এটাকে ঘাড়ের উপর চেপে বসা একটা বোঝা মনে করেন। যদি ভাবতেন একটা নতুন মানুষের জীবনের ট্র্যাক ঠিক করে দেয়ার জন্য আল্লাহ আমাদের দুজনকে এক করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, তাহলেই হয়ে যেত। স্বামী স্ত্রী করেন কী, একজন আরেকজনের উপর রাগ উঠলে বাচ্চাদের সামনে বা বাচ্চাদেরই উপর প্রতিশোধ নেন। অথচ হওয়ার কথা ছিল উল্টো। বাচ্চারা শিখে ফেলবে এই ভয়ে রাগটা কপ করে গিলে ফেলা, কারণ shaping up someone's personality is a far more superior task than winning in this psychological tug of war.

নিদেনপক্ষে অন্য মানুষটার শখের বিষয়টাতে আন্তরিকভাবে উৎসাহ দিলেও হয়। এই যে বিখ্যাত লেখকরা প্রায় সময়ই অদৈহিক ভালবাসার সম্পর্কেজড়িয়ে পড়েন, বেশির ভাগ সময় এটার শুরু হয় তাদের যার যার সৃষ্টি নিয়ে উঁচুমানের মত বিনিময় থেকে। জাগতিক বিষয়াদি হয়ত তার স্ত্রী সামলাচ্ছে, কিন্তু ভাবনার জগতে, সৃষ্টির জগতে সে একদম একা। অন্তত 'প্রথম আলো' উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথের স্ত্রীর বর্ণনা পড়ে আমার ওরকমই মনে হয়েছে। এক জনপ্রিয় সাহিত্যিক তার স্ত্রী সম্পর্কে লিখেছিল, ওর অনেকগুলো মুগ্ধ করা গুণের মধ্যে একটা হল আমি টুকরো টাকরা কাগজে যাই লিখি ও যত্ন করে একটা বাক্সে গুছিয়ে তুলে রাখে, যদি পরে কাজে লাগে! এক অভিনেত্রী তার স্বামী এক্সিডেন্ট এ মারা যাওয়ার পর দুঃখ করে বলছিলেন, আমার সম্পর্কেকাগজে যত রিপোর্ট আসত সব সে সংগ্রহ করে লেমিনেট করে রাখত।

লেখার শুরুতে যে বলেছিলাম, ম্যাজিক স্পেল বা তালিসমান—আমি নিশ্চিত এটাই সে জিনিস। আপনাদের মধ্যে যত সমস্যাই থাকুক, খুঁজে এমন একটা কাজ বের করুন, যেটা দুজনের কাছেই নিঃস্বার্থ ভাল কাজ মনে হয়। যদি সেটা হয় ধর্মচর্চা বা প্রচার, তাহলে ত কথাই নেই। একসাথে করে দেখুন, সঙ্গের মানুষটার জন্য নতুন করে ভালবাসায় বুকটা ভরে যাবে। মনে হবে, s(he) may not be the perfect person of the world, but s(he) is perfect in my world.

[৫]

দম্পতি মানে কী? আভিধানিক অর্থে জায়া আর পতি—সুখী দম্পতি মানে তাহলে একজোড়া সুখী চড়াই চড়ানি—সমীকরণটা যদি এত সহজ হত, তাহলে চারপাশে শুধু সুখেরই বন্যা বইত।

বিয়ের সাথে সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে চলে আসে শ্বশুরবাড়ি, আত্মীয় স্বজন। বিয়ে হলে একটা ছেলেকে বা একটা মেয়েকে একই সাথে অনেকগুলো বন্ধন তৈরি করতে হয়। এদের একেকটার ডাইমেনশন একেক রকম। যেমন শ্বশুর শাশুড়ির চাহিদার সাথে শ্যালক সম্বন্ধীয় আত্মীয়ের চাহিদার মিল নেই। একটা নতুন বউ বা নতুন জামাই, বিয়ের অনুষ্ঠানে যেমন হাসি খুশি, লাজুক

একটা ভাব নিয়ে সম্পর্কের বাঁধনে জড়ায়, নানা ধরণের আত্মীয়ের চাহিদা পূরণ করতে গিয়ে তা থেকে একটু সরে আসলেই অনেক সমালোচনার শিকার হতে হয়।

আজকের লেখাটা শুধু ছেলেদের উদ্দেশ্য করে লিখব। আমি জানি, বিয়ের আগে ছেলেরা খুবই ভয় পেয়ে যায় তার সবচেয়ে প্রিয় দু'জন মানুষ, মা আর স্ত্রীর মধ্যকার সম্পর্ককেমন হবে তাই নিয়ে। অনেক ছেলেই এই অশান্তির ভয়ে বিয়ে করতেও চায়না। তারা বুঝেও উঠতে পারেনা কী এমন হয়ে গেল সকাল থেকে সন্ধ্যার মধ্যে, যে ঘরে পা দিয়েই মায়ের ছলছল চোখ, স্ত্রীর অগ্নিবর্ষণ (অথবা উল্টোটা) দেখতে হচ্ছে। প্রথম প্রথম হয়ত আপনি আসাতে পরিস্থিতি বদলাবে, কিন্তু মনটাকে বদলাবে কে? মায়ের কাছে বউয়ের নামে অসন্তোষ, বউয়ের কাছে মায়ের নামে গঞ্জনা—এসব শুনে শুনে ছেলেটার ত মানুষের উপর থেকে সম্মানটাই উঠে যাওয়ার কথা। প্রথম প্রথম ছেলেটার মন খারাপ থাকে, নিজেকে ব্যর্থ মনে হয়, একটা সময় বুঝতে পারে, উপেক্ষা করাটাই সহজতম পন্থা। দুইজন কে আলাদা আলাদা তাল দিয়ে মন রক্ষা করলেই সুন্দর শান্তি থাকবে ঘরে। আর সব মেয়েলি ব্যাপার নিয়ে ছেলেদের মাথা ঘামাতে নেই। তাদের সমস্যা তারাই সমাধান করুক, এ সময়টা বরং আমি একটু ঘুমিয়ে নেই।

আমি দুঃখিত, সত্যিই দুঃখিত ছেলেদের এই টানাপোড়েন দেখে। শ্যাম রাখি না কুল রাখি—এই করে করে ছেলেটার বেড়ে ওঠাই বন্ধ হয়ে যায়। যে ছেলেটা পরিবার নিয়ে অনেক প্ল্যান করে সুন্দরের পথে এগোনোর দিকে পথপ্রদর্শক হতে পারত, হোম পলিটিক্সের জটিলতায় পড়ে শেষ পর্যন্ত সংসারে তার ভূমিকা হয় নীরব দর্শকের। হয় তখন আপনার স্ত্রীকে নিয়ে আলাদা হয়ে যেতে হবে, নাহয় স্ত্রীর মুখ কড়া শাসন করে বন্ধ রাখতে হবে, বলতে হবে, মাকে মাথায় করে রাখবা—আমি আমার মায়ের নামে কোন কথা শুনতে চাইনা। তোমার যা লাগে আমি দিব কিন্তু সংসারে আমি কোন অশান্তি চাইনা।

আমি দাবি করছিনা আমি এই হাজার বছরের সমস্যার কোন ইনস্ট্যান্ট সমাধান নিয়ে এসেছি। আমি চাই আপনি আপনার ভূমিকাটাকে একটু যাচাই করুন। একজন সন্তান হিসেবে, একজন স্বামী হিসেবে, একটা পরিবারের প্রধান হিসেবে (শ্বশুরেরা সাধারণত মৌনী ঋষি হন—সময় মত খাবার, গরম পানি আর সংবাদপত্র পেলেই তাদের চলে—তাই ফ্যামিলি ম্যানেজমেন্টের হর্তাকর্তা হিসেবে) আপনার কি আরো কিছু করার ছিল? আমি জানি এটা এমন এক সমস্যা যা নিয়ে অফিসের কলিগের সাথে আলাপ করা যায়না। বন্ধুরাও হয়ত ধৈর্য ধরার উপদেশ দিয়েই দায় সারবে। কিন্তু আপনি কি আরো একটু বুদ্ধি খরচ করে আরো একটু বেশি ইফোর্ট দিয়ে পরিবেশটাকে বদলাতে পারতেন? নিদেনপক্ষে আপনার মা ও স্ত্রীর মধ্যে দূরত্বটা একটু ঘুচাতে পারতেন?

প্রথমেই বলি, ছেলেরা ভুল আশা করে যে তার স্ত্রী তার মাকে ঠিক তার মত করেই ভালবাসবে। যদি না পারে, তাহলে দীর্ঘশ্বাস ফেলে, মেয়েরা এত সংকীর্ণমনা কেন? কিন্তু ব্যাপারটা যে অসম্ভব যেকোন মানুষের জন্যই! মায়ের সাথে সম্পর্কটা গড়ে ওঠে অনেক বছরের আদর ভালবাসার উপর ভিত্তি করে। সন্তানের দোষ মায়ের চোখে ধরা পড়ে না, তেমনি বাবা মায়েরও অনেক অন্যায় ছেলে মেয়েরা দেখেও না দেখার ভান করে। অন্য মানুষের জন্য ত এটা করা যায়না। একটা ছেলে কি পারবে তার স্ত্রীর মাকে আপন মায়ের সমান ভালবাসতে? হ্যা, সার্ভিস হয়ত আপন মায়ের সমান দেয়া যায়, কিন্তু দোষ ক্ষমা করার বা উদারতার রেঞ্জটা কিন্তু এখানে কমই হবে, আর এটা খুবই ন্যাচারাল। মানতে কষ্ট হলে নিজেকে দিয়ে একটা এক্সপেরিমেন্ট করে দেখতে পারেন। শ্বশুরবাড়িতে এক মাসের জন্য থেকে আসুন। জামাই হিসেবে না, ছেলে হিসেবে। বাজার করে দিন, বিল দিন, শ্যালিকাকে পড়ান, সংসারের খরচপাতির ব্যবস্থা করুন, শাশুড়িকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যান, তখনই বুঝতে পারবেন অন্য একটা পরিবারে গিয়ে ব্যক্তিত্ব বজায় রেখে দিনের পর দিন সবাইকে খুশি রাখা কত কঠিন।

দ্বিতীয়ত, একজন ভাল মা মানেই একজন ভাল শাশুড়ি না। একজন চমৎকার মানুষ মানেই একজন ভাল বৌমা না। একজন ভাল লেখক যেমন ভাল প্রশাসক না—তেমনি একেকটা সম্পর্কের ডাইমেনশন একেকরকম, দায়িত্বগুলিও ভিন্ন। সেজন্য আপনার ফেরেশতাসম মা শাশুড়ি হিসেবে ব্যর্থ হলে বুক ভেঙে যাওয়ার কোন কারণ নেই। যে মেয়েটা ফুল দেখত, গান গাইত, চিঠি লিখত, বিয়ের পর ঘরে এসে চরম পলিটিক্স শুরু করলে ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেয়ার দরকার নেই।

তৃতীয়ত, মা আর স্ত্রী—এদের মধ্যে যে বন্ধন তা আপনাকে কেন্দ্র করেই রচিত। এই সম্পর্ককোন খাতে বইবে—সেটাও অনেকটা নির্ভর করছে আপনার সাথে তাদের সম্পর্ককেমন তার উপর। এটা একটা টাগ অব ওয়ারের মত, দুটো নারী তাদের সমস্ত কিছু দিয়ে একটা প্রতিযোগিতায় নেমেছে, পুরস্কার আর কিছু না, আপনার অখন্ড মনোযোগ। বাস্তবিক, আমার মনে হয়, ছেলেটার একটা ক্লোন করে যদি দু'জনের হাতে দুটো ধরিয়ে দেয়া যেত—তাহলে বেশ হত।

চতুর্থ, এরকম সিলি বিষয় নিয়ে এরা এমন করে কেন—এরকম একটা উঁচুদরের চিন্তা করে গা বাঁচিয়ে চলার অবকাশ নেই। সিলি বিষয়গুলি মোটেও সিলি না, কারণ এর কারণে পরিবার নামক দেয়ালটায় বড়সড় ফাটল দেখা দিচ্ছে। আপনি কি শুধু এক কোণে দাঁড়িয়ে দেখবেন, আর মাঝে মধ্যে দুই পক্ষেই হাত লাগাবেন? এর বেশি কি আপনার কিছু করার নেই?

[৬]

পরিবারে একজন পুরুষের সবচেয়ে প্রিয় দুইটি নারী—মা আর স্ত্রীর মধ্যকার বিবাদের অনেকটাই চলে ভালবাসার দাবিতে। নতুন দম্পতিরা সত্যিই বুঝতে পারেন না, একে অপরকে নিয়ে ব্যস্ত থাকতে গিয়ে তারা আর সবার থেকে কতটা আলাদা হয়ে গেছেন। একটা ফ্রেন্ড সার্কেলে দুজন জুটি বেঁধে গেলে অন্যদের কেমন হিংসে হয় এটা একটু কল্পনা করলে বুঝতে পারবেন 'কাছের মানুষটা পর হয়ে গেছে'—এই উপলব্ধি পরিবারের অন্যদের কতটা কষ্ট দেয়।

মানি, নতুন দম্পতির পরস্পরকে জানা ও চেনা প্রয়োজন। কিন্তু তা কি আর সব কিছু থেকে নিজেকে আলাদা করে তারপর? দুটো গাছ একজন আরেকজনের উপর ভর করে বেড়ে উঠবে। তার জন্য কি শেকড়গুলি সব উপড়ে তবেই এক হতে হবে? লতাগুলো হয়ত পরস্পরের বাহুডোরে থেকে কিছুই টের পাবেনা। কিন্তু মাটির কান্না? মাটি সে শূন্যতা ভরবে কী দিয়ে? তিল তিল করে বুক চিরে যে আদরের ফসল এত বড় হয়েছে, তার উপস্থিতি ছাড়া মাটির ত আর কিছুই নেই! সে বাঁচবে কী নিয়ে? আমরা সহজে বলি, বাবা মায়েরা আমাদের যথেষ্ট 'স্পেস' দেয়না। সত্যি কথা কী, স্পেস দেয়ার জন্য মায়ার বাঁধন একটা একটা করে ছিঁড়ে রিক্ত শূন্য হয়ে, তবেই স্পেস তৈরি করা যায়। স্পেস মানে ত খালি জায়গা, তাই না? যে জায়গাটা বাবা মা মনোযোগ দিয়ে যত্ন দিয়ে ঘিরে রেখেছিল, স্পেস দেয়ার জন্য সেখান থেকে তাদের নিজেদের গুটিয়ে নিতে হবে, তাই ত?

গাছের উপমায় আবারো ফিরে আসি। শেকড় আর লতানো বাহু—দুটোর টানই তীব্র। দুটোর জন্যই তার আকর্ষণ অসীম। মমতাময়ী মা যেভাবে খাবার জন্য পীড়াপীড়ি করত, অসুখ হলে অস্থির হত—ওই আনন্দগুলি ত অন্যরকম! অমনি করে ভালবাসা পাওয়ার ইচ্ছে ত কোনদিন মরে না। আর স্ত্রী? তার জন্য একটা পুরুষ জীবন দিতে পারে। তার যা আছে সবকিছু বিনিয়োগ করতে পারে। ভুল হয়ে যায় তখনই, যখন ভালবাসায় অবুঝ হয়ে এই মানুষগুলো তাদের আপন আপন গন্ডি ছেড়ে আরও অনেকটা দখল করে নিতে চায়। তাই পুরুষটিকে হতে হবে খুবই সচেতন। মা যেন কখনও না ভাবে ছেলেটা বদলে গেছে। আগের মত করে সময় দিতে না পারলেও আদুরে গলায় 'মা তোমার ঐ রান্নাটা অনেকদিন খাইনা', বা 'মা আমার মাথায় একটু হাত রাখ'—এ ধরণের কথা বলে ছোট ছেলেটা হয়ে গেলে মায়ের অনেক দুঃখ দূর হয়ে যাবে।

মায়ের বয়স হয়েছে, তিনি চান বউ সংসারের দায়িত্ব নিক, কিন্তু এত যত্নে গড়ে তোলা সিস্টেম একটা আনাড়ি মেয়ের হাতে তুলে দেয়ার আগে তিনি চাইবেন মেয়েটাকে তার সিস্টেমে অভ্যস্ত করিয়ে নিতে। কিন্তু সুপারভাইজিং, ট্রেনিং বেশ কঠিন কাজ। অনেক ধৈর্য আর সহনশীলতা দরকার হয়। বিভিন্ন কারণে গুরুজনেরা এই বয়সে অনেক সময় বুঝতেও পারেন না কোন কথাটায় কতটুকুকষ্ট পেতে পারে ছেলেমেয়েরা। এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে সেনসিটিভিটির মাত্রা বদলায়। যুক্তি দিয়ে সরাসরি ভুল ধরাটা আমাদের প্রজন্মে কমন, উনারা হয়ত খুবই আহত হন। আবার স্বভাব চরিত্র নিয়ে একটু খোঁচা মেরে কথা বলাটা উনাদের কাছে হয়ত নিছক রসিকতা, আমরা ভীষণ অফেন্ডেড হই।

যাই হোক, নতুন বউয়ের এ ধরণের আচরণে কষ্ট লাগবে। স্বভাবতই সে সবার আগে স্বামীকে খুলে বলবে। স্বামীর দায়িত্ব এখানে রিঅ্যাক্ট না করে পুরোটা শোনা, মা যদি অন্যায় করে থাকে তাহলে অকপটে স্বীকার করা, তারপর মায়ের দোষগুলোর পিছনে

ওনার ভাল নিয়তটুকু দেখানোর চেষ্টা করা, বা বুঝিয়ে বলা যে এটা জেনারেশন গ্যাপ ইত্যাদি। এতে দুটো সুবিধা আছে। স্ত্রী বুঝবে এটা একটা সমস্যা, আর তা সমাধান করার জন্য সে একা নয়, আরেকটি সহানুভূতিশীল মন তার পাশে আছে। মায়ের দোষ ছেলে স্বীকার করলে স্ত্রী তখন ব্যাপারটাকে একটা সমস্যা হিসেবেই দেখবে, অন্যায় হিসেবে না। এতে করে সমস্যার সমাধান না হোক, সমস্যাটা আপনাদের মধ্যকার বন্ধন আরো দৃঢ় করতেই সাহায্য করবে।

আবার এদিকে মা খুবই কষ্ট পাবেন যদি ছেলে এসে তার দোষ ধরিয়ে দেয় বা বউয়ের দোহাই দেয়। আগে থেকে বাবা মা সমালোচনা গ্রহণ করতে অভ্যস্ত না হলে বিয়ের পরে সে চেষ্টা করতে যাবেন না। বরং এভাবে শুরু করতে পারেন, 'কী মা, তোমার বউ নাকি এটা এটা করেছে!' মায়ের প্রতি আপনার আবেগ যেন প্রকাশ পায়, বউয়ের নাম ধরে না বলে 'তোমার বউ' বলার মাধ্যমে তাদের দুজনের সম্পর্কের উপর জোর দিন (নিজেকে আড়াল করে), 'এটা করেছে' বলার মাধ্যমে হালকা একটা দোষারোপের ভঙ্গি করুন। এতে করে মায়ের মনে 'ছেলে আমার কথা শুনবে না' এই ধরণের ডিফেন্সিভ ভাবটা থাকবেনা। উনি মন খুলে কথা বলতে পারবেন। আপনি আন্তরিকভাবে শুনলেই উনার মনটা অনেক শান্ত হয়ে যাবে। সমস্যা যদি ঘরের কাজ সংক্রান্ত হয় তাহলে কাজটা আপনি শুরু করুন, স্ত্রীকে আগে থেকেই রাজি করিয়ে রাখবেন যাতে সেও জয়েন করে।

বউ শাশুড়ি ঘটিত সমস্যা ত আর হাদীসে নেই, কিন্তু তার সূত্রপাত যেখানে, ভালবাসা জনিত ঈর্ষা, তার উদাহরণ কিন্তু ঠিকই আছে। আয়িশা (রা) এর ঘরে মেহমানদের জন্য রাসুলুল্লাহ (স) এর অপর স্ত্রী খাবার পাঠিয়েছিলেন। আয়িশা (রা) রাগে খাবার সহ বাটি মাটিতে ফেলে দেন। কী অস্বস্তিকর অবস্থা! রাসুলুল্লাহ (স) করলেন কী, 'তোমাদের মা ঈর্ষায় পড়েছেন' বলে নিজেই ভাঙা টুকরাগুলো মাটি থেকে তুলতে লাগলেন। মেহমানদের সামনে অপমান করা হয়েছে মনে করে রাগ করলেন না, শাস্তি দিলেন না, মেহমানদের কাছে বললেন 'তোমাদের মা'; আবার অপর স্ত্রীর বাটি ভেঙে তার উপর অন্যায় করা হয়েছে, এ জন্য আয়িশা (রা) এর ঘর থেকে একটা বাটি নিয়ে উনাকে ফেরত দিলেন।

কে ঠিক আর কে বেঠিক সে বিচার করতে যাবেন না ভুলেও। দুজনেই অবুঝ, দুজনেই আপনাকে খুব ভালবাসে, দুজনেই চায় আপনার ঘরটাকে সুখ দিয়ে ভরিয়ে তুলতে। আপনার কাজ শান্তিপূর্ণ মধ্যস্থতা করা। শেকড় থেকে জীবনীশক্তি আর সঙ্গী গাছের থেকে দৃঢ়তা পেলে একটি গাছ ফুলে ফলে ছায়ায় কত মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে পারবে চিন্তা করে দেখেছেন?

[৭]

দাম্পত্য সিরিজটা আদৌ আর চালাব কি না তা নিয়ে সবসময়েই দোনোমনায় থাকি। কিন্তু পথ চলতে চলতে একেকটা বিষয় চোখে পড়ে, যা নিয়ে প্রায় প্রতি পরিবারেই কিছু না কিছু সমস্যা হয়, তখন মনে হয়, নাহ! লিখি। আর কিছু না হোক, বিষয়টা নিয়ে চিন্তা ত করা হবে।

স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কটা এত বেশি জড়ানো, একে অপরকে নিয়ে, আর তার মাঝে আবেগ ভালবাসার দাবি এত বেশি, যেকোন মুহূর্তের আবেগটুকু চাওয়াটুকু বদলে যেতে পারে ঈর্ষায়। এরকম দম্পতি প্রচুর আছে, বোঝাপড়া খুব ভাল, একজন অপরজনকে ভালও বাসে অনেক, কিন্তু তাদেরই কোন এক বিপরীত লিঙ্গের বন্ধু বা সহকর্মীর সাথে হৃদ্যতাটা একটু বাড়াবাড়ি মনে হয়। সব ঠিকঠাক, কেবল ঐ বন্ধুটির সাথে মিশলেই স্ফুলিঙ্গের মত ভেতরে জ্বলে ওঠে কী যেন। এই ঈর্ষা বুঝিয়ে বলাও যায়না। ব্যাখ্যা করা যায়না, ঈর্ষান্বিত ব্যক্তিটি হয়ত ‘আমি তোমাকে খুব ভালবাসি’ এই যুক্তিতে সাফাই গাইতে চাইবে, কিন্তু অপরজন এটিকে দেখবে হীনমন্যতা, বিশ্বাসের অভাব—এভাবেই। এখানে অন্যান্যবারের মত উভয়পক্ষ নিজেকে খোলাখুলি ব্যক্ত করলেও সমস্যার সমাধান হচ্ছেনা। এবং অবধারিতভাবে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা কমে যাচ্ছে।

আমি সবসময়েই কোন সমস্যা দেখলে তা সমাধান করার আগে উৎসটা খুঁজে বের করার চেষ্টা করি। আমার কাছে মনে হয়েছে সামাজিক মেলামেশার ক্ষেত্রে স্বামী আর স্ত্রীর সীমানাটা যদি ভিন্ন হয়, তখন এই সমস্যার সূত্রপাত হয়। ধরুন আপনি ঢাকা ইউনিভার্সিটি/বুয়েটে পড়েছেন, সহপাঠীর সাথে এক রিকশায় ওঠা আপনার জন্য খুবই সাধারণ ব্যাপার। আপনার স্বামী/স্ত্রী

হয়ত এ ব্যাপারটায় অভ্যস্ত না, তার কাছে দৃষ্টিকটু লাগছে। মানসিক টানাপোড়েনে বন্ধুর সাথে কথা বললেন অবলম্বন চাইতে, বন্ধুর স্বামী/স্ত্রী হয়ত ব্যাপারটা স্বাভাবিক ভাবে নিল না। আপনার স্ত্রী সোশ্যালাইজ করতে পছন্দ করে, আপনি ভালবাসেন নিজের মত থাকতে, আপনার পছন্দকে সম্মান জানিয়ে স্ত্রী যদি একাই সোশ্যালাইজ করতে শুরু করে, কিছুদিনের মধ্যে একটু ঈর্ষা, একটু সন্দেহ মনে চলে আসতেই পারে।

এজন্য এই বিষয়ে পরিষ্কারভাবে কথা বলা খুবই জরুরি, সমস্যা শুরুর আগেই। সবচেয়ে ভাল হয় বিয়ের আগেই না হলে সম্পর্কের শুরুর দিকেই কথা বলে নিলে। এমনি এমনি কোন প্রসঙ্গ ছাড়া আলোচনা করা ত কঠিন, আপনি চাইলে বানিয়ে বানিয়ে আপনার কোন বন্ধুর উদাহরণ দিতে পারেন, 'ওদের এমন হচ্ছে, তুমি কি মনে কর?' তখন এর পক্ষে বিপক্ষে যুক্তি আসবে, হয়ত অপরজন বলবে, 'বিয়ের পরে এত মেলামেশা কী?' অথবা, 'বিশ্বাস থাকলে এগুলো আবার কোন সমস্যা নাকি?'—এভাবে আপনি জানতে পারবেন নারী পুরুষের স্বচ্ছন্দ্যের ঠিক কোথায় আপনার অবস্থান আর কোথায় আপনার সঙ্গীর।

দ্বিতীয় যে কারণটা আমার মনে হয়েছে গুরুত্বপূর্ণ, তা হচ্ছে ইনসিকিউরিটি। আপনার সঙ্গী/সঙ্গিনীর সর্বাবস্থায় আপনিই একমাত্র অবলম্বন আর থাকছেন না—এই বোধটা খুব ভয়ের। আমি ছাড়া আরও কারো সান্নিধ্য তার ভাল লাগতে পারে—এ ব্যাপারটা মানতে যেন খুব কষ্ট হয়। এ ধরণের ঈর্ষা শুধু বিপরীত লিঙ্গের মানুষদের মধ্যেই সীমিত থাকে না, টেলিভিশন, বই, পোষা প্রাণী, এমনকি নিজের সন্তানদের প্রতিও ঈর্ষা আসতে পারে। এই ঈর্ষাটা মূলতঃ ওখান থেকে আসে, যেখানে আপনি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন আপনার জন্য বরাদ্দকৃত সময়টুকুঅন্য কেউ/ কিছু নিয়ে যাচ্ছে।

এ সমস্যা প্রতিরোধের উপায় কী? প্রথমেই চেষ্টা করতে হবে ইনসিকিউরিটি বোধটা দূর করতে। ছোটখাট সারপ্রাইজ, উপহার, তার পছন্দের কোন কাজ (যা আপনি আগে কোনদিন করেন নি)—এসব তার কাছে এই মেসেজটা পৌছাবে যে আপনি তার ছোটখাট সব ভাললাগার দিকেই লক্ষ্য রাখেন। ঈর্ষার উৎস যদি হয় কোন অভ্যাস, বা কোন বন্ধু, সচেতনভাবে তার সামনে কাজ দিয়ে প্রমাণ করুন যে প্রায়োরিটি লিস্টে ওসব কখনোই তার উপরে না। যেমন টিভি দেখার সময় সে কোন কথা বললে টিভিটা বন্ধ করে তার দিকে ঘুরে কথাটা শুনুন। বই পড়ার বেলায় বই বন্ধ করে মুখ তুলে তাকান। কয়েকবার এমন করলে সে মেসেজ পেয়ে যাবে, এরপর থেকে আপনি নরম সুরে বললেই হবে, আমি একটু পরে করি? সহজ! আর যদি ঈর্ষাটা কোন মানুষের বিরুদ্ধে হয়, চেষ্টা করুন এমন কোন ঘটনা এড়িয়ে চলতে যেখানে আপনার স্বামী/স্ত্রী বনাম বন্ধু—এদের মধ্যে কোন একজনের প্রোগ্রাম বেছে নিতে হয়। একই ট্রিকস বাচ্চাদের জন্যেও প্রযোজ্য। বাচ্চারা ঠিকই বুঝে ফেলে বাবা মা তাদের চেয়ে টেলিভিশন কে বা অন্য কিছুকে বেশি প্রাধান্য দিচ্ছে কি না। প্রতিশ্রুতি করে সেটা ভাঙলে কিছুতেই আপনার উপর শ্রদ্ধা বাড়বে না, এটা নিশ্চিত।

ঈর্ষার প্রথম কারণটা আমি মনে করি সমাধান করা বেশি কঠিন। যে রক্ষণশীল তার যেমন নিজের পক্ষে অনেক ভাল ভাল যুক্তি আছে, যে উদার, তারও আছে। অনেক সময় দেখা যায় মানুষ রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গিটাকেই ন্যায্য বলে ধরে নেয়, অপরজন তখন একই সাথে অপমানিত ও অসহায় বোধ করে। এই বোধ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে থাকা খুবই বিপদজনক। কারণ তখন স্বাভাবিক আবেগ ভালবাসার পথ রুদ্ধ হয়ে যায়।

তো কী করতে হবে? যে রক্ষণশীল, তাকেই সহনশীল হতে হবে। কারণ জোর জবরদস্তি করে নিষ্পত্তি করার চেষ্টা করা বোকামি। সম্ভব হলে সরাসরি বলতে পারেন, 'এই কাজগুলো আমি সহজভাবে নিতে পারিনা। আমার মধ্যে প্রচণ্ড ঈর্ষা তৈরি হয়, যা আমি নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারিনা।' তখন অপরপক্ষ স্বাভাবিকভাবেই বলতে পারে, 'এটা তোমার সমস্যা, আমি কেন তার জন্য বন্ধুত্ব নষ্ট করব?' আপনি তখন বুঝিয়ে বলতে পারেন যে, 'একটা পরিবার খুব রক্ষণশীল থেকে খুব উদার—যেকোন অবস্থানে থেকেই চলতে পারে। এটা আমার বা তোমার সমস্যা নয়, এটা আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যের সমস্যা। আমি চেষ্টা করব তোমার মত করে চিন্তা করতে, কিন্তু তুমিও চেষ্টা কর এমন কোন সমস্যা যেন না হয় সেটা খেয়াল রাখতে।' এর পাশাপাশি আপনি যাকে নিয়ে ঈর্ষান্বিত হন, তাকে নিয়ে আরো বেশি বেশি চিন্তা করে দেখুন, সে মানুষটার সব কিছুই কি খারাপ? নাকি একটু দু'টো

কাজ আপনার ভাল লাগেনা। তখন আপনার সঙ্গীকে আরো পরিষ্কার করে বলতে পারবেন, ঠিক এই বিষয়গুলোতে আমার আপত্তি। কেন আপত্তি সেটাও চিন্তা ভাবনা করে নিশ্চিত হয়ে নিন। আপনি যদি এতখানি পরিশ্রম করেন, আপনার সঙ্গী বুঝতে পারবে যে আপনি সত্যিই সমস্যা সমাধানে আন্তরিক। তখন তার তরফ থেকেও আন্তরিকতা বাড়বে।

পরিশেষে, একটা চমৎকার দু'আ করুন দু'জনে মিলে, হে আল্লাহ! আমাদের মধ্যে যে ভুল পথে আছে তাকে তুমি শুধরে দাও, আর যে সঠিক পথে আছে তাকে ধৈর্য ধরার শক্তি দাও।

[৮]

স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্কের কোন না কোন সময়ে একটা জটিলতা সামনে আসেই, তা হচ্ছে আর্থিক দ্বন্দ্ব। হয় স্বামী যথেষ্ট খোরপোস দেয়না, অথবা স্ত্রী প্রয়োজন ও বিলাসিতার মধ্যে পার্থক্য বোঝে না, অথবা বাবার বাড়িতে টাকা পাঠানো নিয়ে সমস্যা হয়, অথবা দেনমোহর এখনও কেন দেয়নি—তা নিয়ে অসন্তুষ্টি... টাকাপয়সাজনিত দ্বন্দ্বের উদাহরণ দিয়ে শেষ করা যাবে না। এই বিষয়টার সবচেয়ে কঠিন দিক হচ্ছে, আলোচনাটা খুব দ্রুত উত্তপ্ত রূপ নেয়, এবং এক পর্যায়ে স্বামী/স্ত্রী এমন কোন মন্তব্য করে বসে যে অপরজন প্রায় বাকি জীবন সে দগদগে ঘা বয়ে বেড়ায়। আমার এক বন্ধু খুব সুন্দর একটা কথা বলে, (যদিও আমি তার সাথে একমত না) সম্পর্কহচ্ছে একটা ভাস্কর্যের মত, প্রতিটা ঘটনা একটা একটা ছাপ রেখে দেয়, এবং তা ভাস্কর্যটাকে নতুন রূপ দেয়। ওর কথা মত ধরলে আমি বলব, টাকাপয়সাজনিত উত্তপ্ত এই মন্তব্যগুলো হচ্ছে হাতুড়ির এক ঘায়ে নাক মুখ খসিয়ে দেয়ার মত। একবার মেরে ফেললে পরে গড়ে তুলতে অনেক বেগ পেতে হয়।

এই সমস্যা নিয়ে লেখা খুব কঠিন ব্যাপার, কারণ এত ডালপালা ছড়ানো যে, কাকে দিয়ে কোথা থেকে শুরু করব, সেটা বোঝাই দায়। মোটা দাগে কয়েকটা দিক আলোচনা করি, বাকিগুলো আশা করি একই ছাঁচে ফেলা যাবে।

১. মাসিক খরচের সাথে বরাদ্দকৃত অর্থের ব্যবধান: যেকোন কারণেই হোক, মাস শেষে আয় ও ব্যয়ের হিসাব মিলে না। এ অবস্থায় একজন অপরজনকে অতিরিক্ত খরুচেপনা বা অতিরিক্ত কিপ্টেমির জন্য দোষারোপ করতে পারে।

২. আয়ের উপর একচেটিয়া অধিকার: স্বামী স্ত্রী দু'জনেই চাকুরিজীবি হলে নিজের আয়ের উপর কতটুকুকর্তৃত্ব থাকবে—এটা নিয়েও চলতে পারে মনোমালিন্য। এমন দেখেছি, স্ত্রীর চাকুরির বিশ ত্রিশ বছর পরেও বেতনের টাকাটা নিজ চোখে দেখার সুযোগ হয়না, স্বামী প্রবর হিসেব মত ব্যাংক থেকে তুলে আনেন, এবং তাঁর বিচার বিবেচনায় খরচ করেন। আবার এমনও দেখেছি, একজনের ব্যাংক ব্যালেন্স অপরজন জানেন না, সংসারের খরচের কতভাগ কে দেবে তা নির্ধারিত হয় আয়ের উপর নির্ভর করে... এ ছাড়া কার টাকা কোথায় খরচ হচ্ছে—এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করার অধিকারটাও অপরজন রাখেন না।

৩. আত্মীয়স্বজনদের সাহায্য বা দান খয়রাত করার ব্যাপারে উভয়পক্ষের সমর্থন না থাকা: হিংসা হোক, স্বার্থপরতাবশতঃ হোক, ক্ষোভ হোক, যথাযথ হোক—যেকোন কারণেই স্ত্রী বা স্বামী অপরপক্ষের আত্মীয় স্বজনের জন্য যেটুকুঅর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে তা নিয়ে স্বচ্ছন্দ বোধ করছেন না।

৪. অনেক আগে শ্বশুরবাড়ি থেকে ধার নেয়া টাকা আর কখনও পরিশোধ করেননি, বা বিয়ের দেনমোহর এখনও শোধ করেননি, এবং এ অভিযোগগুলো উঠে আসছে জীবনের বিভিন্ন ঘাত প্রতিঘাতে, কেবলই প্রতারণার অভিযোগ হয়ে।

বিষয়গুলো লেখার সময় আমি যেন চোখের সামনে অনেক উদাহরণ দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু লেখার ভাষায় যখন প্রকাশ করছি, নিজের কাছেই ছোট লাগছে, মনে হচ্ছে, দাম্পত্যের মধ্যে এমন সংকীর্ণতা চিন্তা করাই পাপ। কিন্তু দুঃখজনকভাবে সত্যি, সংসারের প্রথম দিকে না হলেও, কোন না কোন সময় এমন অনেক দুঃখজনক ঘটনাই ঘটে, যা কিনা হৃদয়কে স্তব্ধ করে দেয়, অপরজনের প্রতি সম্মান নামিয়ে দেয় শূন্যের কোঠায়, এর রেশ চলে বছরের পর বছর, প্রকাশ্যে, অপ্রকাশ্যে, শ্লেষাত্মক কথায় বা নির্লিপ্ত উদাসীনতায়।

সমাধান? আমি আমার ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতা থেকে বলার যোগ্যতা তেমন রাখিনা। যখন সমাধান বলতে যাব তা হয়ত জটিলতার তুলনায় হাস্যকরই শোনাবে। তবু লিখছি, কারণ দাম্পত্য সিরিজের পুরোটুকুই নতুন দম্পতিদের জন্য, যারা এখনও এসব সমস্যার তুঙ্গে ওঠেন নি। তবে সচেতন না হলে একদিন যে উঠবেন, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

বর্তমান সময়ে চাহিদার সাথে সঙ্গতির সামঞ্জস্য রাখা প্রতিটা পরিবারের জন্যই খুব কঠিন। এজন্য যেটা করা যেতে পারে, স্বামী স্ত্রী একটা সময় করে বসে নিজেদের মাসিক আয় কতটুকু সেটার সাথে সাথে কোন খাতে আয়ের কতটুকু খরচ করবেন এমন একটা বাজেট করতে পারেন। সেখানে মুদি খরচ, কাপড়, বাসা ভাড়া, চিকিৎসা—এমন নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসগুলোর হিসেব করে, বাকি যে টাকাটা থাকে তার কত পার্সেন্ট উপহার, বিনোদন ইত্যাদিতে খরচ করবেন সেটা দু'জনে মিলে ঠিক করতে পারেন। খুব স্বাভাবিকভাবেই, এসব বিভিন্ন খাতে দু'জনের চাওয়ার পার্থক্য থাকতে পারে। স্বামী হয়ত চাইছেন আধুনিকতম ইলেক্ট্রনিক্স যন্ত্রটা কিনবেনই, যত টাকাই লাগুক। স্ত্রী হয়ত ভাবছেন, আর যাই হোক, ফেসিয়ালের খরচটা বাদ দেয়ার কোন উপায়ই নেই। সুতরাং, প্রথমবার বাজেট তৈরি করতে গেলে এরকম খুঁটিনাটি প্রায় সবকিছু নিয়েই তাদের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যটা স্পষ্ট হবে। এবং মজার ব্যাপার হচ্ছে, কেনাকাটা বা খরচের ব্যাপারে বড়রাও ছেলেমানুষের মতই গোঁ ধরেন। তো, সেক্ষেত্রে উষ্ণ বাক-বিতন্ডায় না জড়িয়ে অন্যজনকে তখন খুবই ঠান্ডা মাথায় বোঝাতে হবে। কথোপকথনটা চাই কী এমনও হতে পারে—

'বুঝলাম, এই মুহূর্তে একটা এসএলআর না থাকলেই নয়। কিন্তু তুমি চিন্তা কর, আমরা প্রতি মাসে সঞ্চয় করি আয়ের মাত্র বিশ শতাংশ। একটা এসএলআর প্রায় আমাদের পাঁচ মাসের সঞ্চয়ের সমান। আর সঞ্চয়ে তোমার খরচের জন্য বরাদ্দ আছে অর্ধেক, তার মানে, তুমি এখন একটা এসএলআর কিনলে আগামী দশ মাস আর কিছু কিনতে পারছ না। তুমি যদি মনে কর, এসএলআরটা দশ মাসের আর সব কিছুর ছাড়ের সমান, তাহলে কিনতে পার।

বা স্ত্রীর ক্ষেত্রে কাজিনের বিয়ের দাওয়াত উপলক্ষে পার্লারে তিন হাজার টাকা খরচ করা যদি সত্যিই প্রয়োজনীয় মনে হয়, তিনি স্বচ্ছন্দে করতে পারেন, যদি তার জন্য বরাদ্দ খরচের মধ্যেই থাকে। বরাদ্দের বাইরে গিয়ে করতে হলে কান্নাকাটি বা রাগারাগি নয়, যুক্তিপূর্ণভাবে আয়ের উৎসটা দেখিয়ে তারপরই করতে হবে।

শুধু বাজেট করেই ক্ষান্ত হওয়া যাবে না, প্রতিমাসের নির্দিষ্ট দিনে বসতে হবে হিসাব নিয়ে, এ মাসে লক্ষ্যের কতটুকু অর্জন করতে পেরেছি। যে খাতে পারিনি, সেখানে আর কী কী পরিবর্তন আনতে হবে। এ পর্যায়ে চলবে আরেক দফা দোষারোপ.. কিন্তু তার পরেও, শেষ পর্যন্ত যে সিদ্ধান্তটা নেয়া হবে, সেটা নিয়ে বাকি মাস আর কোন অভিযোগ থাকবে না। একইভাবে, তিন চার মাস পর আবারো বিশদভাবে রিভিউ করা যেতে পারে, আদৌ আমাদের বাজেট টা বাস্তবসম্মত ছিল কি না। যদি না হয়, আনা যেতে পারে আরো বড় পরিবর্তন, চাই কি কোন মাসে সব রকমের বিনোদন কাট ছাঁট করে দিলেন, অন্য মাসগুলোর সাথে ব্যালেন্স করার জন্য। এরকম অনেক আইডিয়াই আসবে, যদি প্রতি মাসে নিয়ম করে স্বামী স্ত্রী খরচের বিষয়টা আলাপ করেন।

আরেকটা বিষয় হচ্ছে, নিজের আয়ের উপর কতটুকু অধিকার থাকবে সেটাও অনেক সময় স্বামী স্ত্রীর মধ্যে স্পষ্ট থাকে না। নতুন দম্পতিদের মধ্যে অনেকে এটাই বুঝে উঠতে পারেন না, জয়েন্ট একাউন্ট না রেখে আলাদা একাউন্ট করতে চাওয়াটা অপরাধের পর্যায়ে পড়ে কি না। আবার 'আমি রোজগার করি, আমি খরচ করি—এখানে তুমি বলার কে?' এমন ভাবভঙ্গিও থাকে অনেকের। আমি বলছি না, এর কোনটাতেই কোন সমস্যা আছে। যদি স্বামী স্ত্রী উভয়েই কোন একটা নির্দিষ্ট সেটিং এ স্বচ্ছন্দ বোধ করেন, তাহলে এখানে বলার কিছু নেই। তবে আমার মনে হয়, সংসারের গোড়ার দিকেই এ বিষয়ে কার দৃষ্টিভঙ্গি কী—সেটা স্পষ্ট জেনে নেওয়া ভাল, তা না হলে অকারণে দুঃখ পেতে হবে।

শেষ যে ব্যাপারটায় জোর না দিলেই নয়—স্বামীর বা স্ত্রীর উপর নির্ভরশীল অনেক আত্মীয় থাকতে পারেন, বিশেষ করে বাবা মা ভাই বোন—এদের জন্য খরচ করাটা কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। কিন্তু এই ন্যায়সঙ্গত কাজটাকেও রীতিমত জুলুমের পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারেন অনেকে, যদি আগে থেকেই এখানে সীমারেখা টানা না হয়। কীভাবে এই ভাল কাজটি জুলুম হয়ে যেতে পারে? যদি আপনি এ কাজগুলোতে আপনার জীবনসঙ্গীকে অংশীদার না করেন, তবে একটা সময় তার মনে অভিমান হতে পারে,

‘আমি কি এতই খারাপ, যে আমাকে জানিয়ে করলে আমি বাধা দিতাম?’ তারপর এই অভিমান থেকেই শুরু হবে মুখ গোমড়া করা, অকারণে কঠোর বাক্য বিনিময়—ইত্যাদি ইত্যাদি। ভাল কাজ মিলে মিশে করার মধ্যে খুব বড় রকমের আনন্দ আছে, এবং তা পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাও বাড়িয়ে দেয় বহুগুণ। তাই বলি, রোজগার আপনার নিজের হলেও, আত্মীয় আপনার রক্তের সম্পর্কের হলেও, জীবনসঙ্গীর অনুমতি চান, এতে করে সে সম্মানিত বোধ করবে। আর আপত্তি করলে, আপত্তির কারণ জেনে তা নিয়ে কথা বলতে পারেন, বা আপনার কাছে যুক্তিসঙ্গত মনে না হলে পাত্তা না দিতে পারেন, তবু যে আপনি অনুমতি চাইলেন, এটাই অনেক বড় প্রভাব রাখবে আশা করি।

সত্যি বলতে কি, দাম্পত্যের আনন্দগুলোর অনে...ক রকমের রং, রস, রূপ রয়েছে। কেন জানি আমরা অস্বচ্ছলতাকে অজুহাত বানিয়ে এরকম সব আনন্দের অস্তিত্বকেই অস্বীকার করতে চাই। মানি, অর্থ না থাকলে অনেক স্বপ্নই পূরণ হয়না, অভিযোগের ঝুলিটাও ভারি হতে থাকে। কিন্তু সরবরাহ যেখানে সীমিত, ব্যবস্থাপনার ত সেখানেই সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। সফল ব্যবস্থাপনার প্রথম ধাপ হচ্ছে ম্যাচিউর কমিউনিকেশন। আর্থিক ব্যাপারস্যাপারগুলো নিয়ে বসলেই এ জিনিসটা সবচেয়ে বেশি প্রকট হয়। তাই বলি, এধরণের আলোচনার প্রয়োজনীয়তাটা শুধু টাকাকড়ির মধ্যেই সীমাবদ্ধ না, পরস্পরকে বুঝতেও অনেক বড় ভূমিকা রাখে।

[৯]

আজকে দাম্পত্যের সবচাইতে স্পর্শকাতর বিষয়টা নিয়ে লিখব, যেটা নিয়ে কেউ কথা বলে না। যা নিয়ে অভিযোগ মনে আনাও পাপ, মুখে আনলে ত শেষ! এ বিষয়টা বাদ দিয়ে দাম্পত্য নিয়ে বুলি কপচানো রীতিমত হঠকারিতা, কারণ বিয়ের আগ পর্যন্ত এ নিয়ে মানুষের জল্পনা কল্পনার শেষ থাকে না।

অন্তরঙ্গতা। সোজা ভাষায় শারীরিক সান্নিধ্য। যা নিয়ে বিয়ের আগে মেয়েদের উদ্বেগ, শংকা, লজ্জা মেশানো আকাঙ্ক্ষা, আর ছেলেদের কল্পনা, পরিকল্পনা—কোন কিছুই বাধা মানতে চায়না—তা নিয়েও যে বিয়ের পরে দ্বন্দ্ব অভিযোগের অবকাশ থাকতে পারে, তা বিশ্বাস করা অবিবাহিতদের জন্য কঠিন বৈকি। বিবাহিতদের মধ্যেও অভিযোগগুলো দানা বাঁধলে তারা একরকম ধামা চাপা দিয়েই রাখতে চান। এর মূল কারণ, এসব বিষয়ে লজ্জার বাঁধ ভেঙে কথা বলা রীতিমত অসম্ভব, কারণ নিজের স্বামী/স্ত্রীর সম্পর্কেএতটা খোলামেলা আলোচনা করা তাঁকে অসম্মান করারই সামিল। তাছাড়া এমন মানুষ আশপাশে পাওয়াও বেশ কঠিন যে একই সাথে উদার মনের, সমাধান জানে, গোপনীয়তা বজায় রাখবে এবং যার সম্পর্কেবলা তাকে আগের মতই সম্মান করবে।

শারীরিক অন্তরঙ্গতা দম্পতির মাঝে এক নিগূঢ় যোগাযোগের মাধ্যম। এ যেন ছোটবেলার ‘কোড ওয়ার্ড’ দিয়ে কথা বলার মত। আশপাশে আরো অনেকে থাকলেও তাদের নিজস্ব হাসি, ঠাট্টা, ছেলেমানুষি আনন্দের ভাগ দিতে হবে না কাউকেই। শরীরি আনন্দের মূর্ছনাকে তুলনা করা যায় অনন্য সাধারণ সঙ্গীতের সাথে—যার বোদ্ধা সমঝদার পুরো পৃথিবীতে মাত্র দু’জন। শরীরের সান্নিধ্য তাই অনেক সময় মনকে আরো কাছাকাছি এনে দেয়।

কিন্তু, আর সব পার্থিব সৌন্দর্যের মতই এতেও কদাকার কুচ্ছিত বেসুরো তান ঢুকে যেতে পারে। বিয়ের আগে মিডিয়ার কল্যাণে ভালবাসার যে রূপটি আমাদের মধ্যে গাঁথা হয়ে যায়, তা ভীষণ রোমান্টিক, ভীষণ সুন্দর। সত্যিকারের জীবনে দৈহিক ভালবাসা সবসময় তেমনি করে নাও আসতে পারে। বইয়ের পাতায় বা রূপালি পর্দায় অন্তরঙ্গতা যেভাবে আসে ভালবাসার চিত্ররূপ হয়ে—বাস্তব সবসময় তেমন নাও হতে পারে। দৈহিক মিলন শুধুই কাছে আসার আকুতির প্রকাশ না, এটি একটি জৈবিক চাহিদাও। আর সব সাইকেল এর মত নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে এই চাহিদাও পূরণ করা প্রয়োজন। কিন্তু সমস্যা এখানে না। সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় যখন স্বামী/স্ত্রী বিয়ের আগের ধরে রাখা এক মাইন্ডসেট নিয়ে আশা করে থাকেন প্রতিবারই ভালবাসা তার পূর্ণরূপ নিয়ে মহাকাব্য রচনা করবে। চাহিদা কিন্তু তার প্রয়োজন পূরণের দিকেই নিবদ্ধ থাকে, আর তার কারণে উপক্রমণিকার অংশটুকুখুব অল্প, বা অনুপস্থিত থাকতে পারে কখনও কখনও। যে মানুষটি স্বপ্নে এই সময়টুকুকে নিয়ে অনেক কাব্যগাঁথা রচনা করেছে, সে

বাস্তবতার এই ধাক্কায় বিমূঢ় হয়ে যেতে পারে।

ফলাফল, ‘আমি কেবলই তার প্রয়োজন পূরণের মাধ্যম, আমার প্রতি তার কোন আকর্ষণ নেই...’ এ ধরণের উপসংহার টানা। এমনকি হীনম্মন্যতা, অতিরিক্ত সন্দেহপ্রবণতা, তুচ্ছ কারণে অভিযোগ—এধরণের ব্যাখ্যাতীত আচরণের অনেকটাও এধরণের অতৃপ্তি থেকে আসে।

এখানে উভয়পক্ষকেই বুঝতে হবে, শারীরিক সান্নিধ্যের উৎস দুইটি। ভালবাসা/কাছে আসার আকুলতা, এবং পিওর বায়োলজিক্যাল নিড। সম্পর্কযত পুরনো হয়, প্রতিটা আবেগ প্রকাশের পেছনে মূল কারণটা বোঝা সহজ হয়ে যায়। অনেক দম্পতিই করেন কি, শরীরের প্রয়োজনে কাছে আসার আহ্বান কে শ্রদ্ধা করেন না। ভেতরে জমে থাকা রাগের ঝাল মেটান অপরজনের প্রয়োজন কে উপেক্ষা করে। ক্লান্তি, ব্যস্ততার অজুহাত দেখান। এই প্রয়োজনটুকু পূরণ করতে যেহেতু অপরজনের সহযোগিতা অপরিহার্য, তাই উপেক্ষা অনুরোধকারীকে একই সাথে আহত ও অপমানিত করে।

আমাদের দম্পতিরা অনেক সময়ই জানেন না, সাড়া না দেয়াটা কি আদৌ অপরাধের পর্যায়ে পড়ে কি না। একজন হয়ত ব্যাপারটাকে গুরুত্বই দিচ্ছেনা, আর অন্যজন আহত অহংবোধ নিয়ে মনে মনে দূরে সরে যাচ্ছে। আজকালকার দিনে অহর্নিশ মানুষকে ব্যস্ত রাখার অনেক উপকরণ আছে, তাই সঙ্গ না থাকলেও অনেক কিছুর মাঝে ডুবে থাকা যায়, সঙ্গী হয়ত টেরও পাবে না কবে সে অনেক দূরে চলে গেছে। তার মানে এই না যে, নিজের ইচ্ছা অনিচ্ছার কোন দাম থাকবে না। উপেক্ষাকে একটু বদলে ‘সম্মান ও কারণ দর্শনপূর্বক অসম্মতি’-তে বদলে দিলেই দূরত্বের ভয়টা ঘুচে যাবে।

বিবাহিত মেয়েদের কমন অভিযোগ, ও আমার প্রতি আগের মত আকর্ষণ বোধ করেনা। ছেলেদের অভিযোগ, ও গৃহিণী হতে গিয়ে প্রেমিকা হতে ভুলে গেছে। ভাল কাপড় পরে না, সুগন্ধি মাখে না... কিছু বললে ঘরকন্নার দশটা অজুহাত দেখায়।

এসব সমস্যার সমাধান বাইরের কারো কাছ থেকে আশা করা বোকামি। প্রতিটা দম্পতির যোগাযোগের ধরণ স্বতন্ত্র। তাই স্ত্রীকে নিজে নিজেই বুঝতে হবে, তার দাম্পত্যের জন্য কোনটা বেশি প্রয়োজন, পরিচ্ছন্ন ঘরদোর, না পরিচ্ছন্ন পোশাক আশাক। স্বামীর ও তেমনি বুঝতে হবে, একজন লেখক কেবল নিজের খেয়াল খুশিমত লিখে গেলেই পাঠকের কাছে গ্রহণীয় হয়না, পাঠকের চাহিদারও মূল্যায়ন করতে হয়। তাছাড়া সাহিত্যে ছোটগল্পের প্রয়োজন যেমন আছে, তেমনি উপন্যাসেরও আছে। একটি সার্থক উপন্যাস অনেক ছোটগল্পের প্লট তৈরিতে সাহায্য করতে পারে।

(আমার লেখায় স্থূলতা প্রকাশ পেলে একান্তভাবে ক্ষমা চাচ্ছি।)

[১০]

বর্তমান সময়কার দম্পতির মাঝে 'কনফ্লিক্ট অব ইন্টারেস্ট' থাকা খুব স্বাভাবিক। কনফ্লিক্ট অব ইন্টারেস্ট—শুনতে খুব ভারিক্কি মনে হলেও, শেষ পর্যন্ত এর প্রয়োগ দেখা যায় একদম চাল চুলো, গম আলু তে। টিভির রিমোট কাড়ার মত ছোট বিষয় থেকে শুরু করে জীবনের প্রতি দর্শন—যে কোন কিছুই কনফ্লিক্ট অব ইন্টারেস্টের আওতায় পড়তে পারে।

কনফ্লিক্ট অব ইন্টারেস্ট কী? এটা কি কেবলই ভিন্নমত? না! বরং ভিন্নমতের/ভিন্ন পছন্দের দু'জন আলাপ আলোচনা করে অন্যের যুক্তিটাকে মেনে নিয়ে পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা রেখেই যখন জানায়, এই অভ্যাসটা/দর্শনটা/প্রিয় বস্তুটা আমি ছাড়তে পারব না—তখন তাকে কনফ্লিক্ট অব ইন্টারেস্টের আওতায় ফেলা যায়।

কনফ্লিক্ট অব ইন্টারেস্ট হতে পারে খুব ছোট কোন বিষয় নিয়ে। হয়ত পার্সোনাল স্পেসের মাত্রাটা ভিন্ন, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা নিয়ে খুঁতখুঁতেপনা একজনের বেশি। আবার হতে পারে অনেক বড়—হয়তবা জীবনের সার্থকতার মাত্রাটাই। আপনার ইচ্ছে করে আয়েশ করে জীবন কাটাতে। আপনার জীবনসঙ্গীর ভীষণ ইচ্ছে পুরো বাংলাদেশটা পায়ে হেঁটে ঘুরে দেখার।

মনে হচ্ছে এমন আর কী? থাকলোই নাহয় ভিন্নতা, অসুবিধা কী? অসুবিধা আছে। প্রতিদিনের কাজে বারবার করে খটিমটি বাঁধবে দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতার কারণে। আপনার জীবনসঙ্গী হয়ত যেভাবে ভুল সংশোধন করে সেটা আপনার পছন্দ না। শোধরাতে চাইবেন, দেখবেন তার ভেতরে গেড়ে আছে এই বোধ—ভুল শোধরাতে হলে শক্ত না হয়ে উপায় নেই। এর ফলাফল পড়বে সন্তানদের বড় করায়।

আপনার জীবনসঙ্গী বন্ধুদের জন্য খরচের ব্যাপারে বেশ উদারহস্ত। আর আপনি মনে করেন জীবনের জন্য এত খরচের প্রয়োজনটা কী? বিলাসিতা আপনার চক্ষুশূল। কী হবে? প্রতিবার এধরণের আয়োজনে আপনি গোমড়া হয়ে থাকবেন।

আরো উদাহরণ দিতে হবে? ঠিক আছে। ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির কথাই বলি। দু'জনেই ধার্মিক। একজন উদারমনা ধার্মিক, একজন কট্টর ধার্মিক। একজন দান সদকা ও সামান্য আয়ে সাধারণ জীবনযাপনের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে আগ্রহী, অন্যজন জ্ঞানচর্চা, জীবিকায় উন্নতির শিখরে চড়ে মুসলিমদের এগিয়ে নিয়ে যেতে আগ্রহী। ভাবছেন সমস্যাটা কী? ধরুন একটা ভালো চাকরির সুযোগ আছে, কিন্তু এতে করে পরিবারে সময় দেয়া কমে যাবে অনেকটাই। দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতার কারণে একজন উৎসাহ দেবেন, অপরজন আপত্তি জানাবেন।

এই বিষয়গুলোকে মতদ্বৈততা না বলে ইন্টারেস্টে কনফ্লিক্ট বলছি কেন? কারণ মতের এই ভিন্নতা তৈরি হয়েছে জীবনদর্শনের ভিন্নতা থেকে। আপনি মত বদলাতে পারবেন, জীবনদর্শন বদলাতে পারবেন না। ফলস্বরূপ আপনার উৎসাহে আপনার সঙ্গী সাময়িকভাবে কাজটাতে সম্মতি দিলেও আপনি যে পর্যায়ের আন্তরিকতা আশা করছেন, সেটা পাবেন না কখনোই।

তো কী করা যায়? আপনাদের প্রায়ই ঘুরেফিরে যে জিনিসগুলো নিয়ে খিটিমিটি লাগে, বোঝার চেষ্টা করুন সেটা চিন্তাধারা/জীবনাদর্শের ভিন্নতা থেকে হচ্ছে কি না। যদি তা হয়, তবে বৃথাই একই তর্কবৃত্তে ঘুরে ঘুরে না মরে, বৃত্তের বাইরে এসে দাঁড়ান। চিন্তা করে দেখুন নিজের বা তার এই দর্শনটা বদলানো সম্ভব কি না। যদি না হয়, মেনে নিন।

মেনে নেয়া বলতে কি বোঝায় যত খারাপই লাগুক, হাসিমুখে মেনে নেয়া? মোটেও না। সঙ্গীকে জানিয়ে দিন, তোমার এই দৃষ্টিভঙ্গিকে আমি সমর্থন করিনা। আমি নিজে এভাবে জীবন কাটাতে চাইনা। এমনকি সেটা যদি হয় স্বচ্ছলতা-কৃচ্ছ্রতার দ্বন্দ্ব, নিজের জীবনে আপনারটা মেনে চলুন, আর তাকেও তারটা মানতে দিন।

আগেই বলেছি, জীবন সম্পর্কেদৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা থাকলে প্যারেন্টিং ইস্যুতে এসে খুব সমস্যা হয়ে যায়। একজন হয়ত দামি দামি খেলনা, কাপড় কিনে দিচ্ছে, অন্যজন সহজ জীবনের কথা বলেই যাচ্ছেন—এতে করে ছেলেমেয়েরা বাবামায়ের অন্তর্দ্বন্দ্বটা বুঝতে পারে খুব সহজে, আর তারা জীবন সম্পর্কেনির্দেশনাটাও ঠিকমত পায়না।

সমাধান কী? সমাধান হচ্ছে আগে থেকেই এ বিষয়গুলো চিহ্নিত করে জীবনসঙ্গীর সাথে কথা বলা। তাকে জানানো আমি এভাবে জীবনকে সাজাতে চাই, তুমি কী মনে কর? আমার সন্তানদের এভাবে বড় করতে চাই, তোমার আপত্তি থাকলে আগে থেকেই কথা বলে নেয়া ভালো। অন্তত সন্তানদের সামনে যেন দ্বন্দ্বটা প্রকট হয়ে না ওঠে। এমনকি চাইলে এটাও সম্ভব, সন্তানদের বোঝানো, 'তোর বাবা/মা এমন মনে করে, কিন্তু আমি এমন মনে করি। দুইজনেই ঠিক, তুই তোর পথটা পছন্দ করে নিবি।' অথবা, 'তোর বাবা/মা জিনিসটাকে এভাবে দেখে। আমার মনে হয় এভাবে হলে ব্যাপারটা আরো ভালো হত।' এভাবে প্রকাশ করলে সন্তানেরা ভিন্নমত সহ্য করেও সুন্দরভাবে বেড়ে ওঠার একটা বাস্তব শিক্ষা পাবে।

পরমত-অসহনশীলতার যে মাত্রাতিরিক্ত প্রকাশ দেখা যাচ্ছে আজকাল—ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে তার থেকে রক্ষা করতে পরিবারের মধ্যে কনফ্লিক্ট অব ইন্টারেস্টগুলো আগেই চিহ্নিত করে নেয়া ভালো।

পরিশেষে, রেহনুমা আপুর প্রিয় এক উক্তি শরৎচন্দ্রের রচনা থেকে—

অভিমানের যেখানে মূল্য নাই, সেখানে অভিমান প্রকাশের ন্যায় বিড়ম্বনা আর নাই।

প্রতিটা বিষয় মতে মিলতেই হবে এমন কোন কথা নেই। আর না মিললেই অভিমান, দুঃখ নিয়ে জীবনটাকে ব্যর্থ মনে করতে হবে, এমনও কোন কথা নেই। কোন কোন পথ একলা চলেও উপভোগ করা যায়, যদি জানেন সমান্তরাল আরও একটি পথের শেষে আবারও তার সাথে দেখা হবে।

[১১]

আজকের বিষয়টি একটু অদ্ভুত শোনাতে পারে। দাম্পত্যের একটি পর্যায়ে আপনার সত্যিই জানা দরকার মেনে নেয়া কাকে বলে।

যদি একই বিষয় নিয়ে অসংখ্যবার ঝগড়া হয়ে যায়, এর পরেও কোন পরিবর্তন না আসে, একটু ভেবে দেখার দরকার আছে, এই অবস্থা মেনে নেয়া আমার পক্ষে সম্ভব কি না। কিছু বাস্তব উদাহরণ দেই—

(১) নাবিলা প্রকৃতি অসম্ভব ভালোবাসে। বৃষ্টি হলে সব এলোমেলো হয়ে যেতে চায় তার। ওর বর ঘরের বাইরে যেতেই চায়না। অফিসের পর বাকি সময় ল্যাপটপে নাক গুঁজে থাকতেই তার যত আনন্দ। একেকটা দিন ঝিরিঝিরি বৃষ্টিতে ওর খুব ইচ্ছে হয় নুপুর পায়ে রাস্তায় হাঁটতে। কিন্তু কার সাথে? একা? একটুও ভালো লাগে না ওর। পূর্ণিমা কত অজস্র বার সমস্ত পৃথিবীতে স্বপ্নের তুলি বুলিয়ে গেল—কিন্তু পার্থ কোনদিনই তাই নিয়ে উচ্ছ্বসিত হল না।

এ নিয়ে ঝগড়া হয়েছে, কান্নাকাটি, অভিযোগ, বুঝিয়ে শুনিয়ে ঘরের বাইরে নিয়ে যাওয়া—এমনকি কাকুতি মিনতিও করেছে। ভদ্রতা করে পার্থ সময় দেয়, কিন্তু তাকে যে একটুও ছোঁয় না এসব বুঝতে পেরে নাবিলাই হাল ছেড়ে দিয়েছে।

(২) আরিফ চটপটে স্মার্ট একটা ছেলে। সংসার, ক্যারিয়ার সবই সময় মত গুছিয়ে নিয়েছে। এখন থেকে আগামি দশ বছরের প্ল্যান মাথায় আঁকা আছে তার। পঁচিশে নিজের খরচে বিয়ে, ঊনত্রিশে নিজ এপার্টমেন্টে প্রথম সন্তান—এগুলো কোনটিই তার পরিকল্পনার বাইরে ছিল না। শুধু, শুধু ... ভাবতে ভাবতে ভুরু কুঁচকে যায় ওর। শুধু এই মিথিলাকে নিয়েই হয়েছে যত বিপদ। চার বছরেও একটু সংসারি হল না মেয়েটা। মানুষের চিন্তায় ঘুম নেই, ভবিষ্যতের পরিকল্পনা নেই, চাকুরিতে মন নেই—কেবল কীভাবে কার কী হল না হল—কাকে কীভাবে সাহায্য করা যায়—আরে বাবা! নিজের উন্নতি হলেই না দেশের উন্নতি। এত বলে, একটু টাকা পয়সার হিসাব কর, নিজেকে সেটল করার চেষ্টা কর—কীসের কী! মিথিলা ডুবে আছে দশের চিন্তায়।

(৩) মুনা ও ইশতিয়াকের বিয়ের বারো বছর হতে চলল। ওদের ঘর টিপটপ সাজানো গোছান। এক কণা ধুলোও পড়তে পারেনা। মুনার মাত্রাতিরিক্ত শুচিবাই এর যন্ত্রণায় ঘরের মানুষগুলি তটস্থ হয়ে থাকে একেবারে। একটু এদিক থেকে ওদিক হলে খণ্ডপ্রলয় হয়ে যায়। ইশতিয়াকের পরিবার কেবল না, মুনার বাবা মাও অনেক চেষ্টা করেছে। একসময় ইশতিয়াক ভেবেছিল সন্তান আসলে সব ঠিক হয়ে যাবে। হয়নি। সন্তানের যত্নআত্তি সব করেও মুনা কী করে যেন ঠিকই সময় বের করে নেয়।

(৪) জামান সাহেব পলিটিক্স এর পোকা। রাতভর টিভিতে টক শো, দিনে সবগুলো পেপার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়া—লং ডিস্টেন্স কলে লম্বা লম্বা আলাপ জমানো—উনার আর কিছু নেই, পলিটিক্সই ধ্যান জ্ঞান। উনার স্ত্রী চাকুরি, সন্তান বড় করা, ঘরকন্না সব করেও ভদ্রলোকের মনের থই পান না। স্বাভাবিকভাবেই উনার মনে জমে আছে অসংখ্য অভিযোগ। যাকে পান তার কাছেই বলে মনের বোঝা হালকা করেন। না, জামান সাহেব পরিবারকে অর্থকষ্টে রাখেননি কোনো দিন, কিন্তু অর্থ সরবরাহের বাইরে সত্যিকার অর্থে তেমন কিছু আর করেনও নি।

এই গল্পগুলো একটাও কি আজগুবি মনে হচ্ছে? নিশ্চয় না। অমন জমে থাকা পুরনো ক্ষোভ কোন দম্পতির না থাকে? স্বামীটা মনের মত হয়নি, বা স্ত্রী তার নিজের জগতে থাকে—এমন অভিযোগ ছাড়া দম্পতি পাওয়াই ভার। অভিযোগের বৈশিষ্ট্যই এই, একের পর এক প্রলেপ পড়তে পড়তে গাঢ় বর্ণের হয়ে যায়। যেহেতু অনেকবার চেষ্টা করেও বদলানো যায়নি—তাই যতবার ব্যর্থ হয়েছে ততবার এক পোঁচ করে তিক্ততার রঙ লেগেছে। এরপর যত সময় যাবে, একেকটা অভিযোগ পুরনো সবগুলো স্মৃতির

বোঝা সঙ্গে করে নিয়ে আসবে। তখন ঐ ছোট্ট ঘটনাটাও ক্রমাগত অভ্যাসের কারণে বড় হয়ে দাঁড়াবে। বলে না—ছোট পাপও বার বার করলে বড় পাপ হয়ে যায়—ছোট দুঃখও বার বার ছাপ ফেলতে ফেলতে গভীর দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

এখানেই ছাড় দেয়ার প্রশ্ন আসে। যখন অপরজনের একটা অভ্যাস বা স্বভাব আপনার মধ্যে বিরক্তির উদ্রেক করে, কিন্তু সবরকমের চেষ্টা করেও একে বদলাতে পারেন নি। আপনার পক্ষে কি সম্ভব একে মেনে নেয়া? নিজেকে প্রশ্ন করে দেখুন—

- এই অভ্যাস কি তার মজ্জাগত?
- আমি কি আমার পক্ষে যত ধরণের চেষ্টা সম্ভব সব ভাবে চেষ্টা করেছি?
- ঐ বিরক্তিকর অভ্যাস/স্বভাবটার বাইরে বাকি সময়টা কি আমাদের সুন্দর কাটে?
- ঐ স্বভাবের কারণে আমি যা হারাচ্ছি তাকে মেনে নিয়ে কি আমি সুখে থাকতে পারবো?

উপরের উদাহরণগুলোতে দেখুন, মিথিলা স্বভাবগতভাবেই পরোপকারী। ওর চিন্তাগুলো এমনভাবেই বিকশিত হয়েছে। ওর পক্ষে আরিফের মত করে চিন্তা করা প্রায় অসম্ভব, যেমন অসম্ভব আরিফের পক্ষে নিজের জীবনের প্ল্যানের উপরে অন্যের জন্য উপকার করাকে স্থান দেয়া। মুনার ভয়ানক শুচিতার এই স্বভাবটা না থাকলে ওদের পরিবারে আরও অনেক বেশি আনন্দ থাকত হয়তো, কিন্তু এতে করে ইশতিয়াককে ঘরকন্না সম্পর্কিত চিন্তাভাবনা প্রায় করতেই হয়না। উপরন্তু ও একটা টিপটপ সাজানো গোছান সংসার পেয়ে যাচ্ছে কিছু ধরাবাঁধা নিয়ম মেনে চলে!

একইভাবে, বৃষ্টিভেজা পথে নাবিলা পার্থকে না পেলেও বৃষ্টির সৌন্দর্য মিথ্যে হয়ে যায়নি। নূপুরের শব্দের প্রতি কোন মোহ না থাকলেও পার্থ তার নিজের মত করে নাবিলাকে ভালবেসেছে। হ্যাঁ, নাবিলার স্বপ্নের মত হয়নি, কিন্তু বাস্তবটাও সুন্দর, অন্যরকম। মিসেস জামানের এই মানুষটার প্রতি অনেক ক্ষোভ থাকলেও তিনি বুঝে গেছেন, এর বাইরে আর কিছু হবার নয়। যদি জামান সাহেব অন্যরকম হতেন, উনিও অন্য রকমের এক স্ত্রী হতেন। লতায় পাতায় শান্তি অশান্তি সুখ অসুখের মধ্য দিয়েই কেমন করে যেন জীবনটা কেটে যাচ্ছে। উনার চাওয়ার ১০০ ভাগ উনি কোনদিন পাননি, কিন্তু যে পঞ্চাশ ভাগ পেয়েছেন, তার চারপাশেই বৃত্ত রচনা করে আশার পরিধি ছোট করে এনেছেন। দিন শেষে সুখের পূর্ণতার খোঁজে সবাই যে কেবল দিকভ্রান্ত হয়ে ফেরে, তা বুঝতে উনার ভুল হয়নি।

ছাড় দেয়া ক্ষেত্রবিশেষে মহৎ, আবার ক্ষেত্রবিশেষে অন্যায়ও। ইবাদতে ফরজ আর নফলের মাঝে যেমন পার্থক্য স্পষ্ট, সহনশীলতার বেলায়ও তেমনি বিভাজন রেখাটা স্পষ্ট থাকা উচিৎ। অনেক সময় ডমেস্টিক ভায়োলেন্সের শিকার নারী/পুরুষটিকে উপদেশ দেয়া হয় সংসারের স্বার্থে মেনে নিতে; বা স্ত্রীর বা স্বামীর অবশ্যকর্তব্যগুলি পালন করেন না এমন মানুষের বেলায় বলা হয়—“তারপরেও তো তোমার সাথে একজন আছে। না থাকলে কী করবা?” উল্লেখ্য, ছাড় দেয়ার বোধ নিজের ভেতর থেকেই আসতে হবে, অন্যে যেন জোর করে রাজি না করায়। আর অন্যায়ের প্রশ্রয় দিয়ে নিজের ও সন্তানদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করাকে ছাড় দেয়া বলে না—অন্যায় বলে। আমরা যখন বুঝব অদূর ও সুদূর ভবিষ্যতের কল্যাণের জন্য দাম্পত্যে কোন বিষয়গুলি অপরিহার্য, তখন ছাড় দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়াটাও সহজ হয়ে আসবে।